বিমূর্তায়নের প্রক্রিয়া : জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ

শিবাজীপ্রতিম বসু

সূত্রপাত

'বিমূর্ততা' বা 'বিমূর্তায়ন'— কথাগুলো যতই গম্ভীর-দার্শনিক শোনাক এবং তার মধ্যে গ্রীক, জার্মান, বা ভারতীয় ভাববাদের যত অনুষঙ্গই থাকুক না কেন— আমাদের আটপৌরে জীবনের সর্বস্তরে চলেছে তার নিরন্তর ব্যবহার। একটু অন্যভাবে বলা যায় বিমূর্তায়নের হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই।

(ক) আদিম যুগ থেকে সভ্যতার যত বিবর্তন ঘটছে, ততই মানুষ এগিয়ে চলেছে নূতনতর এবং জটিলতর বিমূর্তায়নের দিকে। দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি— সর্বত্র চলেছে এই প্রক্রিয়া— যা কিছু নির্দিষ্ট/বিশেষ তাকে ক্রমশ গ্রাস করছে নির্বিশেষ বা বিমূর্ত।

(খ) সব ধরনের বিমূর্তই ক্রমোচ্চগামী। অর্থাৎ যত ক্ষুদ্র পরিসরের বিমূর্তই হোক তার প্রবণতা থাকে— যাকে 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা'-ও বলা যায়— ক্রমশ সার্বজনীন (universal) হয়ে ওঠার এবং একটা 'grand narrative' রচনা করার। যেমন,

সন্তানের প্রতি মায়ের যে স্নেহ-উৎকণ্ঠা-ত্যাগ স্বীকার তার সাধারণ পরিচয় মেলে ‘মাতৃত্ব’ ধারণাটিতে। কিন্তু ক্রমে ‘মাতা’ হয়ে ওঠেন ‘দেশমাতা’/‘বিশ্বমাতা’/‘ঈশ্বরী-মাতা’। তখন মাতৃত্বের অর্থ ও ক্ষেত্রও ব্যাপক হয়ে পড়ে এবং শেষ অবধি তা এমন এক জগজ্জনীন মাতৃত্বের ধারণায় পৌঁছায়, যা জগতের সৃষ্টি-ধ্বংস-সারাৎসারের একক নিয়ন্তা। তাকে উপলব্ধি করতে হলে অনুসরণ করতে হবে ‘মাতৃতন্ত্র’-এর পথ। তেমনি, পিতা/পিতৃত্ব থেকে ‘জগৎপিতা’ বা ‘পরমপিতা’, ‘পুরুষ’ থেকে জন্ম নিয়েছেন ‘পরমপুরুষ’।

(গ) বিমূর্ত ধারণা কখনোই ‘প্রকৃত বাস্তব’ (real concrete) নয়। তবু সামাজিক ক্ষেত্রে, আমরা কখনোই তাকে ‘ভ্রান্ত চেতনা’ (false consciousness) বলে নস্যাৎ করতে পারি না। সমাজমানসে, আচরণে তারও রয়েছে একটি গাঠনিক অস্তিত্ব। অথচ তার গঠন প্রকৃত বস্তু জগতের গঠনের চেয়ে ভিন্নরূপ। কথাটি নানা কারণে ভেবে দেখা দরকার। ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি বহু যুক্তিবাদী (মার্ক্সবাদী ?) অথবা বুদ্ধিজীবী আন্দোলনকারীরা সমাজের বহু কুসংস্কারাচ্ছন্ন, প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মীয়, মৌলবাদী এমনকি জাতীয়তাবাদী ধারণা বা বিশ্বাসকে ‘ভ্রান্ত চেতনা’ বলে উড়িয়ে দিতে চান। ফলে উপেক্ষিত থাকে ঐসব ধারণা ও বিশ্বাসের গাঠনিক দিকগুলি নিয়ে সমীক্ষা, আলোচনা ও উপলব্ধি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু অগভীর সমালোচনা করে তাঁরা কর্তব্য সমাধা করেন। সমস্যাগুলির মর্মভেদ করা হয় না— মোকাবিলা তো নয়ই।

(ঘ) বিমূর্ততা যেমন মূর্তকে বা নির্দিষ্টকে ক্রমশ গ্রাস করে বিমূর্ততার এক বিশ্বব্যবস্থা (একদিক থেকে দেখলে যা metaphysics) কায়েম করতে চাইছে, তেমনি মূর্ত বা নির্দিষ্ট, ক্ষুদ্রও (সাম্প্রতিক তত্ত্বচর্চা অনুসরণ করে যাকে আমরা ‘fragments’-ও বলতে পারি) সংগ্রাম করে চলেছে বিমূর্তব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কখনো নিচু গলায়, কখনো সোচ্চারে তারা নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

আধুনিক সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের অতি পরিচিত বিমূর্ত বর্গীকরণ : জাতি (nation), জাতীয়তা (nationality) ও জাতীয়তাবাদ (nationalism) সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় ঐ কথাগুলো মনে রাখার প্রয়োজন আছে।

॥ এক ॥

আজকের দিনে ‘জাতি’ বা ‘জাতীয়তা’ কথাগুলোর গুরুত্ব ও ব্যঞ্জনা যে কতখানি— তা কারো অজানা নয়। বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা অন্যতম নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত এই দশকে, যখন সমাজতন্ত্রের ‘আন্তর্জাতিক’ আকাশ খান খান হয়ে জেগে উঠেছে প্রাচীন/অর্বাচীন, বিস্মৃত/নবলব্ধ জাতিসত্তার অসংখ্য স্বতন্ত্র নভোমণ্ডল, আবার রাষ্ট্রীয় বিচ্ছেদের ‘প্রাচীর’ ভেঙে ‘খণ্ডিত’ জাতিসত্তা হয়ে উঠেছে ‘অখণ্ড’।

কেবল রাজনীতির আঙিনায় নয়, ব্যক্তিগত জীবনের নানা পর্যায়ে : পরীক্ষা ও কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে বিদেশগমনের স্তরে, মায় ভোটদান এমনকি ঋণপ্রাপ্তি পর্যন্ত—

সর্বক্ষেত্রেই কবুল করতে হবে আমাদের জাতীয় 'পরিচয়' (identity) বা জাতীয়তার কথা। এ যেন কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতোই আমাদের চিরজন্মের সাথী হয়ে রইল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই জাতীয় পরিচয় আমাদের বংশগত পদবীর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। আসলে 'জাতীয়তা' হল একটা গোষ্ঠী পরিচয়— যে গোষ্ঠীর নাম বলা বাহুল্য, 'জাতি'। ঐ গোষ্ঠী, প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রাথমিক গোষ্ঠীর পরিচয়কে অতিক্রম করে, একটি বা কয়েকটি বিমূর্ত ঐক্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ঐক্যবোধ বা ভাব যখন অন্য জাতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জাহির করে তখন তাকেই বলে 'জাতীয়তাবাদ'। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে যুদ্ধের সময় বা আন্তর্জাতিক খেলার মাঠে— এই অনুভূতির পরিচয় প্রতিনিয়ত পাওয়া যায়। এর ফলেই বোধ করি, যারা কোনোদিন ব্যাট-বল স্পর্শও করেনি, তারাও চায়ের আসরে বলতে ছাড়ে না, '**আমরা** আজ কী দারুণ খেললাম !' বা 'পাকিস্তানকে কেমন জব্দ **করলাম** !'

এখানে বাস্তব 'আমরা' বা নির্দিষ্ট 'আমরা' বিমূর্ত '**আমাদের**' মধ্যে নিজেদের চিহ্নিত করলাম।

উক্ত প্রক্রিয়াটি এতই স্বাভাবিক যে মনে হয়, এই ভাবটি যেন গোষ্ঠীজীবন যাপনের শুরু থেকেই আমাদের মধ্যে সক্রিয় ছিল। সত্যি সত্যি একদল মানুষ, (যাদের মধ্যে তাত্ত্বিকরাও আছেন) মনে করেন 'জাতি' ও 'জাতীয়তাবাদ'-এর উৎস অতি প্রাচীন। কেবল জাতীয়তাবাদী তাত্ত্বিকরাই নন, ফরাসী স্ট্রাকচারাল-মার্ক্সবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক নিকো পোলানৎজাসও মনে করেন যে 'জাতি'গুলির আছে 'ইতিহাস [ঐতিহাসিক কাল] উত্তীর্ণ অ-সংকোচন যোগ্যতা'। অর্থাৎ বিভিন্ন ঐতিহাসিক কাল উত্তীর্ণ হয়ে প্রবাহিত হয়ে জাতিসত্তা/মনোভাব, যা প্রায় অবিনাশী।

তথ্যের ভিত্তিতে দেখলে অবশ্য এই দাবি নেহাতই অমূলক মনে হবে। এমনকি বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধানের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে' (১৭৭৬) 'নেশন' বা 'জাতি' কথাটি ছিল না, ছিল 'পিপল' বা 'জনগণ', পরে ১৭৮৯ সালের সংবিধানে 'পিপল'কে প্রতিস্থাপন করে 'নেশন'।

তার মানে এই নয় যে, নরগোষ্ঠী, জন্মভূমি, সাম্রাজ্য এবং ধর্ম বা শ্রেণীভিত্তিক কোনো 'যৌথ' ঐক্যের ধারণা আগে ছিল না। কিন্তু 'নেশন'-এর ধারণা (আমরা যে অর্থে আজ তাকে জানি) তার জন্ম হয় ইয়োরোপে অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে— ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতার যুগে। একটু ভালভাবে বলতে গেলে 'জ্ঞানদীপ্তি'র (enlightenment) পরবর্তীকালে, সেটা ছিল 'যুক্তিবাদ'-এর (rationalism) যুগ, যুক্তির আলোকে সব কিছু চিনে নেবার যুগ। অর্থাৎ, মনে করা হত, যুক্তির একটি সাধারণ ও সর্বগ্রাহ্য মাপকাঠি/দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা সম্ভব— যার অজানা, অগম্য কিছুই নেই— যা খুব ন্যায়সঙ্গতভাবে একটি সার্বজনীন সত্য অনুসন্ধান করবে বা একটি বিশ্ববীক্ষা রচনা করবে।

জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শাস্ত্র গড়ে উঠতে থাকে যা বিশ্বের এ-তাবৎ অজানা বিষয়গুলির ক্ষেত্রে 'systematic' জ্ঞানচর্চা শুরু করে, বা বলা যেতে পারে সমস্ত বিষয়, বস্তু বা ইতিহাসকেই একটি 'system of knowledge'-এর আওতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয়— যে 'ব্যবস্থা' (system) গড়ে উঠেছে উত্তর-জ্ঞানদীপ্তি পর্যায়ে ইয়োরোপীয় জ্ঞানচর্চার আদর্শগুলিকে কেন্দ্র করে— যেখানে ইয়োরোপ হল 'Knower' বা 'Subject' এবং (ইয়োরোপ বহির্ভূত) **অন্যান্য** বিষয়, বস্তু বা বিশেষ করে ইতিহাস ও সংস্কৃতি হল জ্ঞানলাভের বিষয় বা 'Object'. আরো পরিশীলিত পরিভাষায় বলতে গেলে, সংস্কৃতি ও ইতিহাসমূলক জ্ঞানচর্চার এ-হেন কাণ্ডে ইয়োরোপ হল **'আত্ম'** (Self) — অন্যরা **'পর'** (Other)। এডওয়ার্ড সাইদ-এর বুদ্ধিদীপ্ত, বিশ্লেষণাত্মক রচনাসমূহ প্রকাশ হওয়ার পর আজ বিষয়টি সুধীসমাজেও বহুল আলোচিত বিষয়।

ইয়োরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির এই পর্যায়ে জাতীয়তাবাদের জন্ম। তাই তার মধ্যে আমরা 'জ্ঞানদীপ্তি'-র নানা জ্ঞানতান্ত্রিক প্রবণতা ও মতাদর্শ লক্ষ করি। যেমন, একদিকে 'সার্বজনীনতা'র প্রবণতা, আবার অন্যদিকে চলে 'আত্ম' ও 'পর'-এর বিভাজন ক্রিয়া। বস্তুত, জাতীয়তাবাদের প্রস্তুতিকালীন পর্যায়ে এই দ্বিতীয় প্রবণতা— অর্থাৎ 'আত্ম' ও 'পর'-এর বিভাজনই প্রাবল্য পায়। ফলে, অনেক সময় মনে হয় যে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্তি ও যুক্তিবাদ উৎসারিত বিশ্বজনীনতার একটা বিরোধ আছে বা অন্যভাষায় (যেমন, এলি কেডৌরি বলেছেন) জাতীয়তাবাদ হল অযৌক্তিক ও ধ্বংসাত্মক। কিন্তু আমরা দেখব, কীভাবে 'পরিণত' জাতীয়তাবাদে এই বিরোধের ('বিশ্ব'জনীনতা বনাম 'আমাদের' স্বাতন্ত্র্যের) 'প্রায়' নিষ্পত্তি ঘটে। তবে তার আগে দেখতে হবে জাতীয়তাবাদী বিমূর্তায়নের নানা প্রক্রিয়া।

।। দুই ।।

জাতীয়তাবাদী বিমূর্ততার মধ্যে রয়েছে সার্বজনীনতার দুটি স্তর। একটি বিশ্বজনীন সার্বজনীনতা, অপরটি জাতীয়ক্ষেত্রের সার্বজনীনতা।

বিশ্বজনীন সার্বজনীনতা গড়ে ওঠে 'সার্বজনীন' ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কারিগরী এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের ধ্যানধারণা থেকে। জাতীয়তাবাদের যুগেই ইতিহাসচর্চা সার্বজনীন হয়ে ওঠে বা বলা চলে, এই সময়েই এ বিশ্বাস জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে যে মনুষ্যসমাজের একটি সার্বজনীন ও সর্বব্যাপী ইতিহাস আছে। জাতীয়তাবাদবিষয়ক পুরনো তত্ত্বকারদের চোখেও এ বৈশিষ্ট্য এড়ায়নি। যেমন Hans Kohn এর কথায় : 'The age of nationalism represents the first period of *universal* history, what preceded it was a long era of separate civilizations and continents among which little, if any, inter-course or contact existed.'

বলা বাহুল্য এই 'universal history' বিভিন্ন অ-পশ্চিমী দেশগুলির ইতিহাস বিচার বা ব্যাখ্যা করার কিছু 'সাধারণ পরিমাপক' (standard yardstick) ব্যবহার শুরু করে। যেমন, গত শতকের গোড়ায়, যখন পশ্চিমী যুক্তিবাদ ও জাতীয়তাবাদ এদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি, সেই সময় বাঙলায় লেখা প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'রাজাবলী'র লিখনশৈলী, তথ্য উপস্থাপন সবকিছুই 'পুরাণ' নির্ভর— অর্থাৎ তথ্যের বস্তুগত বিশ্বাসযোগ্যতা ও পারম্পর্যরক্ষা প্রভৃতি যে সব উপাদান আধুনিক ইতিহাসচর্চার প্রাথমিক শর্ত বলে বিবেচিত হয়— এ যেন তার বাইরে কোনো 'অ-যৌক্তিক', 'অনৈতিহাসিক' কাহিনী। কিন্তু এই গ্রন্থের অর্ধশতাব্দী পর যখন ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাব এদেশের জ্ঞানচর্চায় প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং যখন দেশীয় এলিটের চেতনায় জাতীয়তাবাদ আসি-আসি করছে, তখনকার ইতিহাস গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রে, শৈলী, পদ্ধতি, তথ্যচয়ন এমনকি বর্ণনা— সবকিছুর মধ্যে সেই ঘরানার ছাপ অতি স্পষ্ট। উক্ত ঘরানা গড়ে উঠেছিল ইয়োরোপীয় 'সার্বজনীন' ইতিহাসচর্চার দ্বারা।

অন্য এক প্রক্রিয়ায় জাতীয়তাবাদ 'জাতীয়' ক্ষেত্রের সার্বজনীনতা— যা তার অস্তিত্বের প্রধান যুক্তিপ্রদায়িনী— গড়ে তোলে এবং তাকে অন্য জাতীয়তার বিপরীতে স্থাপন করে— অর্থাৎ, এখানেও দুটি স্তরে বিমূর্ততা ক্রিয়া করে একটি 'জাতীয়-আত্ম'-এর স্তর এবং অন্যটি 'অপর-জাতীয়তা'র স্তর। এ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ একটি বা কয়েকটি সাংস্কৃতিক/ রাজনৈতিক উপাদান বেছে নিয়ে একটি জনসমাজের সমস্ত অংশের ওপর বিমূর্তভাবে প্রয়োগ করে।

এই উপাদানগুলির কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই, তবে সাধারণত ভাষা, ধর্ম, আঞ্চলিকতা, অতীত গৌরব, বিদেশী জাতির বিরোধিতা প্রভৃতি যে কোনো একটি/কয়েকটি/সবকটি উপাদান কাজে লাগিয়ে বিমূর্ত ঐক্য গড়ে তোলা হয়। এই প্রক্রিয়ায়, স্বাভাবিক-ভাবেই, ব্যক্তিকে তার নির্দিষ্ট আঞ্চলিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে উৎপাটিত করে প্রতিষ্ঠিত করা হয় একটি বা কয়েকটি বিমূর্ত ঐক্যবিন্দুর ওপর। যেমন, যে ফরাসী ভাষা ফরাসী জাতীয়তাবাদের অন্যতম ভিত্তি— তা গড়ে উঠেছিল বিপ্লব-পরবর্তী ফ্রান্সে বহু আঞ্চলিক ভাষাকে আত্মসাৎ করে বা প্রান্তে ঠেলে দিয়ে। আবার বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন দেখিয়েছেন কীভাবে print-capitalism-এর যুগে রুশ ভাষার আগ্রাসনে রুশ জাতির জন্ম হয়েছিল, এমনকি, স্বামী বিবেকানন্দ 'তাঁর 'বাঙগালা ভাষা' সম্বন্ধীয় আলোচনায় জানিয়েছেন কীভাবে ও কেন বাঁকুড়া, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য আঞ্চলিক বাঙলাকে পরাস্ত করে 'কলকাতার ভাষা'ই বাঙলার মূলস্রোত হিসেবে গণ্য হবে।

অনেক সময় কোনো একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক/ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকেও আরোপ করা হয় 'অন্য' অঞ্চলগুলির ওপর। তখন পরিচয়ে, বর্ণনায়, গাথায়, গানে ঐ বিশেষ অঞ্চলটিই হয়ে ওঠে জাতি-প্রতিম— যেমন ইংল্যান্ড, ওয়েলশ ও স্কটল্যান্ডের মধ্যে ইংল্যান্ডই গোটা 'ইউনাইটেড কিংডম'-এর জাতীয়তার প্রতীক। আজ আমাদের দেশের হিন্দিবলয়ের সংস্কৃতিকেই গোটা জাতির সংস্কৃতি বলে চালানোর অপচেষ্টাকে আমরা

যতই ধিক্কৃত করি না কেন, ভুলে গেলে চলবে না এ প্রচেষ্টাও নতুন নয়। উনিশ শতকের বাঙালি মনীষীরাও প্রায় তা-ই করেছিলেন। নতুবা, 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং— যা আসলে বাঙলার ভূ-প্রাকৃতিক ('কাল্পনিক' ?) বিবরণ, তার সঙ্গে থর মরুভূমির অঙ্কে পালিত জনগোষ্ঠী কোন্ মন্ত্রে একাত্ম বোধ করবে? অথবা, গ্রাম বাঙলার (পোশাক, পরিধান শৈলী, মুখাবয়বে এই পরিচয় স্পষ্ট) বিধবা স্নেহময়ী 'জননী'র প্রতিকৃতিকে বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা 'ভারতমাতা' আখ্যা দিলেও অরুণাচল প্রদেশের 'সন্তান'দল তাঁকে প্রথম দেখায় 'মা' বলে চিনবে কি? আমার ধারণা, 'বিশ্বমাতা'র ছবি আঁকতে দিলেও বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা একই জিনিস আঁকতেন।

।। তিন ।।

সুতরাং, আমরা দেখলাম, জাতীয়তাবাদ— যার তাত্ত্বিক উৎস ইয়োরোপীয় জ্ঞানদীপ্তি— দু ধরনের সার্বজনীন-বিমূর্ত সত্তার জন্ম দেয়: একটি 'আমরা' বা 'আমাদের' সত্তা এবং একটি 'তারা' বা 'তাদের' সত্তা। বস্তুত, 'তারা' আছে বলেই বিপরীতে 'আমরা' আছি।

এখন মনে হতে পারে, এই 'আমাদের'-'তাদের' জাতীয় বিমূর্ত বিভাজন— জ্ঞানদীপ্তি উৎসারিত বিশ্বজনীন যুক্তিবাদেরও বিরোধী। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট রাষ্ট্রতত্ত্বকার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কিছু আলোচনা অবশ্য-উল্লেখ্য। তাঁর মতে, আঠারো শতকের যুক্তিবাদের যেমন ছিল বিশ্বজনীন বাসনা— অর্থাৎ সমগ্র জীবন ও জগতকে কিছু সাধারণ বিচারপদ্ধতি, রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ করার ইচ্ছা, আরেকটি উপাদানেরও তেমনি জন্মলগ্ন থেকেই রয়েছে বিশ্বজনীন বাসনা— বলা বাহুল্য এই উপাদানটি হল পুঁজি বা capital— যা যুক্তিবাদের মতোই, বা বলা ভালো যুক্তিবাদকে কাজে লাগিয়ে চেয়েছে তার বিশ্বজনীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে। যুক্তিবাদীর মতোই সে দাবি করে, বিকাশের একটি মাত্র সার্বজনীন পথ আছে— যার নিয়ন্তা পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। কিন্তু, যা অনেক সময় অনুক্ত থাকে, তা হল 'পশ্চিমী' বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা করা সম্ভব শেষপর্যন্ত শ্রমের চূড়ান্ত সামাজিক বিভাজন ঘটিয়ে এবং আমরা জানি, সামাজিক শ্রম বিভাজনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে পুঁজি। এই দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়, যুক্তিবাদ সমর্থিত পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর বিকাশ এবং পুঁজিবাদী বিকাশ জ্ঞানতত্ত্বগত-ভাবে একে অন্যের পরিপূরক।

অনেক সময় মনে হতে পারে একটি 'জাতীয়' ঐক্যের তত্ত্ব, (বিশেষত ঔপনিবেশিক দেশগুলির ক্ষেত্রে), হয়তো একটি বিশ্বজনীন-বিমূর্ত বিকাশের ধারণার অর্থাৎ বিকাশের পশ্চিমী মডেলের বিরোধিতা করে। তাকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং তাকে রুখে দেয়। যেমন, ভারতে গান্ধীবাদী জাতীয়তাবাদ কেবল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতাই করেনি— তা বিকাশের পশ্চিমী তত্ত্বটিকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। তাই, 'চরকা'

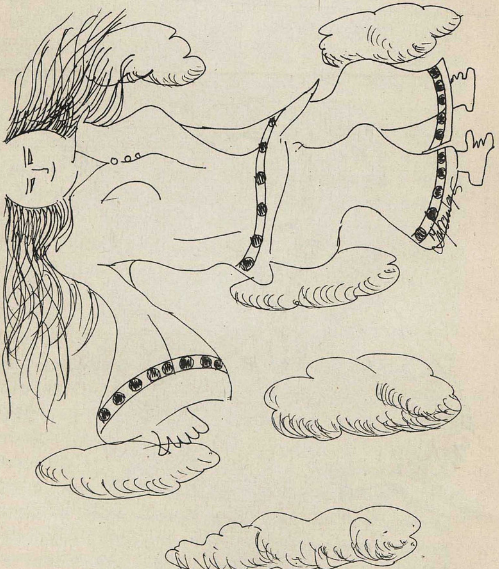

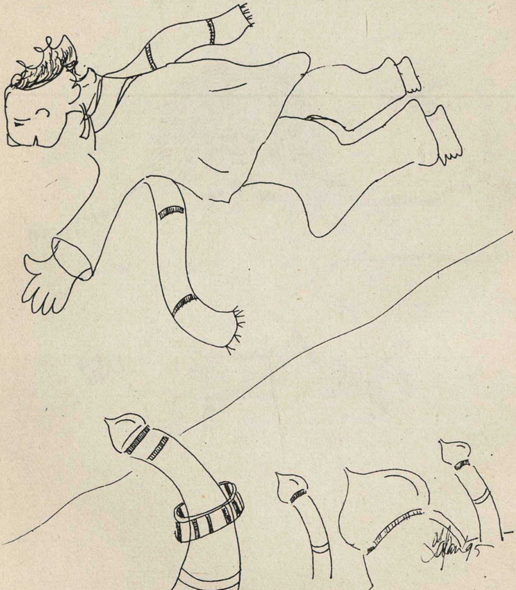

গান্ধীর কাছে নিছক সুতো-কাটার যন্ত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে (অসহযোগপর্বে) তাঁর বিখ্যাত বিতর্কে গান্ধী জানিয়েছিলেন 'চরকা হল ভারতের আর্থিক মুক্তির একমাত্র সার্বজনীন পথ।' কারণ, অন্যত্র জানিয়েছেন তিনি, চরকা হল গ্রামীণ সারল্যের (যা পশ্চিমী জটিল যন্ত্র সভ্যতার বিপরীত) **প্রতীক**।

কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, ঔপনিবেশিক-জাতীয়তাবাদের আছে এক জন্মগত দো-টানা— একদিকে বিশ্বজনীন যুক্তি/বিকাশ/প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার ; অন্যদিকে এই বিশ্বজনীন গ্রাসের মধ্যে, [কল্পিত] 'আমাদের' স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা। ঔপনিবেশিক-প্রস্তুতিকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোনো বিশেষ পর্যায়ে বিকাশের 'পশ্চিমী' মডেলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 'আমাদের' ভুবন (সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্র) তৈরির চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এই ভিন্ন ভুবন, জ্ঞানতত্ত্বগতভাবে, পশ্চিমী মডেল-কে রুখে দিতে পারেনি। কারণ, জ্ঞানদীপ্তির সন্তান হিসেবে প্রতিটি জাতীয়তাবাদ শেষ বিচারে (অর্থাৎ 'জাতীয়-রাষ্ট্র' হয়ে ওঠার পর্যায়ে) বিকাশমুখী এবং এই বিকাশের মাত্রা অবশ্যই পশ্চিমী মাপকাঠিতেই বিচার্য।

তাই প্রতীক বদলে যায়, মীথ বদলে যায়— অনেকটা সতীনাথ ভাদুড়ির উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর 'গানহী বাওয়া'র মতো। তাৎমাটুলির তাৎমাদের সরল বিশ্বাসে গানহী বাওয়া একদিন বিলিতি কুমড়োর খোসায় 'মুরত ধরে' দেখা দিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন পর, তাৎমারা ঠাহর করতে পারে না কী করে, 'গানহী মহারাজ, পুরোন গানহী বাওয়া হঠাৎ কবে থেকে মহাৎমাজী হয়ে গিয়েছেন'।

কিন্তু আমাদের গল্পের এখানেই শেষ নয়। ঔপনিবেশিক-জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে মীথ-এর আরো বদল হয়— নেতৃত্ব, আদর্শ সব পালটে যায় : সর্ব-শক্তিমান নেতা তাঁর জীবদ্দশাতেই পরিণত হন ঔপচারিক রবার স্ট্যাম্প-এ। তাই প্রাক-জাতীয়রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভারতের চরকা, শিল্পযন্ত্রের বিরোধিতায় বিশেষ গুরুত্ব পেলেও স্বাধীন ভারতে পশ্চিমী অর্থে শিল্পোন্নয়নই হয়ে ওঠে গুরুত্বের কেন্দ্রভূমি। গান্ধী তাঁর দর্শনসমেত হারিয়ে যান। উঠে আসেন নেহরু।

আপাতবিরোধী মনে হলেও এইভাবে জাতীয়তাবাদী বিমূর্ততা একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে ও যুক্ত করে। রাজনৈতিক স্তরে সে অন্যান্য জাতির থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে। আবার বিকাশের প্রশ্নে সে আত্মসমর্পণ করে পুঁজিবাদ-উৎসারিত সার্বজনীনতার কাছে। হয়তো এই প্রক্রিয়া অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু তা বলে জাতীয়তাবাদের স্বস্তি নেই। টিভি-র পর্দায় রুপোলি নায়কের সঙ্গে গলা ফাটিয়ে 'মিলে সুর মেরা তুম্‌হারা' গাইলেও মাঝে মাঝেই সুর কেটে যায় এখানে সেখানে। মেট্রোপলিটান এলিট সংস্কৃতির ফাটল চুঁইয়ে ভেসে আসে লোকায়ত সংস্কৃতির শব্দ ও গন্ধ। বনাঞ্চলের মানুষ, পাহাড়ী মানুষ, ব্রাত্যমানুষের ক্রোধ ফেটে পড়ে এদিক-সেদিক। ফরাক্কা বাঁধের অপার আলোক-সজ্জাকে ব্যঙ্গ করে চারপাশের ঘন অন্ধকার। এখনো ঠুনঠুন রিক্সাওয়ালাকে 'দেশ' কোথায় জিজ্ঞেস করলে, সহাস্য উত্তর মেলে, 'ছাপরা জিলা'। □